কেষ্ট ঠাকুরের দূরদর্শিতা আর মশা

সব্যসাচী সরকার

কথায় বলে , পত্তনী ভুমিখণ্ডে সান অফ দি সয়েলদের একটা প্রাথমিক অধিকার বর্তায় । আমার দৃষ্টি অত্যন্ত সংকুচিত তাই আমার এই প্রতিবেদন শুধুমাত্র বঙ্গপ্রদেশের জন্য। অবশ্য আই আই টী কানপুর ক্যাম্পাস এই নিয়মের ব্যতিক্রম, অকৃতজ্ঞ হতে চাই না । নুন খেয়েছি অনেক বছর তাই নমকহারামী করতে পারবো না।এটা অবশ্য টাটা নমকের 'দেশকা নমক' বিজ্ঞাপন দেখে ও শুনে ব্যবহার করছি-জানিনা আই আই টী কানপুর বা নিদেন পক্ষে কানপুরে নুন তৈরীর কারখানা আছে কি না । টাটা বাদ দিলে ভারতের অন্য নুন তৈরীর কোম্পানী গুলি বোধ হয় অতলান্ত বা প্রশান্ত মহাসাগরের জল আমদানী করে ফোরেন্ ফ্লেভারের বিদেশী নমক ভারতে পরিবেষন করে থাকেন। মহাসাগরের লবনীয় জলের অধিকার সম্বন্ধে রাষ্ট্রকুলের বিধি ও বিলি ব্যবস্থা টাটা নমকের বিজ্ঞাপনের জন্য হয়তো পরিবর্তীত হতে পারে।অবশ্য 'দেশকা নমক' স্লোগানে কোনো বিশেষ দেশের নামের উল্লেখ নেই তাই এই স্লোগানটি প্রত্যেক দেশই তার নিজের ভাষায় ব্যবহার করতে পারে। এই ভাষ্যটি ব্যবহার করলে ইনটেলকচুয়াল প্রপার্টীর জন্য টাটাকে তার কপিরাইট প্রাপ্য অর্থ হয়তো দিতে হতে পারে । আজকাল নাকি স্বপ্নকেও পেটেন্ট করা যায়। সুধীজন আমার এই কথনকে পরিমার্জিত ও বিস্তারিত করে যদি বিশ্বের দরবারে বহু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়ে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাদের আমি সাধুবাদ জানাবো ।নুন নিয়ে মশার প্রতিবেদনের কারন আছে পরে তা লিখছি।

অতি প্রাচীন কালে সগর রাজার ছেলেদের পরিনিতি, গঙ্গা অবতরন ও কপিল মুনির আশ্রমের কথা আমরা পড়ে ও শুনে আসছি। তাত্বিক আলোচনার মধ্য না গিয়ে এটুকু লিখতে পারি যে সগর রাজাদের রাজত্বে এই গঙ্গা-সাগরের মোহানাস্থিত স্থলভুমিতে মানুষের উপস্থিতি বা বসতি খুব একটা ছিল না তবে মুনি ঋষিদের বসতি দুর্গম জায়গায় হয়ে থাকে তাই কপিল মুনির আশ্রমের অবস্থিতি নিয়ে জল না ঘোলা করাই ভালো। এর পরের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখতে গেলে ইক্ষাকু বংশের সগর রাজার পূর্বপুরুষ হরিশচন্দ্র ও পরে রাম ও শেষে ইক্ষাকু রাজার ভগিনী, ইলার বংশে পুরুরভার নাতি যযাতির পুত্র কুরু ও তার পরে শ্বান্তনু-ভরত পেরিয়ে মহাভারতের কথা আসে। ছিন্নমুল পাণ্ডবদের রাজ্যলাভের আশায় ভারত ভ্রমনে অনেক জায়গার নাম জানা যায় তবে হস্তিনাপুরের পূর্ব দিশায় মগধ,অঙ্গ ও প্রাকজোতিষপুরের নাম গুলি ছাড়া অন্য কোনো বসতির নাম পাওয়া যায়না। পান্ডবগন বঙ্গদেশ বলে আজকের ভুখন্ডটিকে বাসযোগ্য মনে না করার জন্য এই প্রদেশটি পান্ডব বর্জিত দেশ বলে সবাই মনে করে। মহাভারতে এই জায়গা নিয়ে কোনো টীকা না থাকার জন্য আপামর মানুষদের এরকম বিশ্বাস।আমার ধারনা যে শ্রীকৃষ্ণ পান্ডবদের এই ভুখন্ডে আসতে নিষেধ করেছিলেন। সমুদ্রকুলের কাছের এই ভুখন্ডটিকে যযাতির আরেক পুত্র যদুর বংশের শ্রেষ্ঠ নায়ক শ্রীকৃষ্ণর মত পণ্ডিত ও বিচক্ষন ব্যক্তিও তাঁর মথুরা –বৃন্দাবন ত্যাগে আকৃষ্ট করতে পারেনি তাই তিনি অনেক দূরে আরবসমুদ্র কুলস্থিত দ্বারকা বেছে নিলেন।দুষ্ট লোকেরা মগধের জরাসন্ধের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ রনছোড়ছি নামে দ্বারকা পালিয়ে গেলেন বলে অপপ্রচার করে থাকেন। জরাসন্ধ বা শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণর ভয় পাওয়া হাস্যকর তবে আমার দৃড় বিশ্বাস যে ননী মাখনে আসক্ত শ্রীকৃষ্ণ শুধু নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্যই নয় বরং তাঁর অসংখ গবাদি পশুর রক্ষার্তে শুধুমাত্র জলাভুমির রক্ত চোষা জোঁক ও মশক কুলের ভয়ে বঙ্গকে পরিত্যাগ করে গুজরাতকে বেছে নিয়েছিলেন। এর অনেক যুগ পরে রামধুন গাইতে গাইতে মহাত্মা গান্ধীও শুধুমাত্র কম হাঁটতে হবে ভেবে দেশী নুন কুড়োতে গুজরাতের ডান্ডীকেই বেছে নিলেন। মহাত্মা বহু দিন তাঁর সোধপুরের আশ্রমে দিন কাটিয়েছেন তাই সেখান থেকে গঙ্গাসাগরে হাঁটা ও নুন কুড়োনো খুবই সহজ হোতো।এটা কাকতালীয়ই হোক বা গান্ধীর নিজপ্রদেশ প্রেমই হোক, এবারো মশাযুক্ত বঙ্গের কপালে এই স্বদেশী নমকের তকমা লাগিয়ে জায়গাটা যে মোটামুটি ভালো তা বোঝানো গেলো না । মানে মশার জন্যই আমরা দেশকা নমকএর জায়গা নিতে পারলাম না । এইবঙ্গে শুধু টাটা নমকেই ঘটনাটা সিমীত থাকলো না বিশয়টা ন্যানো পর্যন্ত গড়ালো ।

বহু যুগের ভুমিকম্প ও সুনামীর সাহায্যে বঙ্গোপসাগর, আদিসপ্তগ্রাম ও তাম্রলীপ্ত থেকে সরতে সরতে বর্তমানে সুন্দরবন পরিবেষ্টিত ভুমিখন্ডটিকে, উত্তর দিশায় আস্তে আস্তে এগিয়ে গ্রাস করতে আসছে । বণিকের মাপদন্ড রাজদন্ডের পরিবর্তনের রাজনৈতিক ব্যাক্ষা আমার কাজ নয় তবে ঐ সময় আমরা বন্দুক কামানের ব্যবহার শিখলাম আর মানুষে মানুষে লড়াই ও মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্য বাঘ ও অন্য বড় বড় জন্তুদের মেরে জঙ্গল পরিষ্কার করে দিলাম। কিন্তু জোঁক ও মশাদের সরাতে

পারলাম না । তবুও নিজেদের ও স্ব প্রয়োজনীয় স্বল্প গবাদিপশুর জন্য এই পরিত্যাজ্য জলাভুমিকে কোনোরকমে বাসযোগ্য করে ফেললাম। জলাভুমিকে নিবাসের জায়গা করতে গিয়ে আর একটা ভুল আর তা হলো – মানুষের বর্জিত দ্রব্যগুলির জন্য বাড়ীর দরজার পাশে পুকুর(আসলে বাড়ীর লাগোয়া এক কচুরীপানা যুক্ত ডোবা) পাড়ের জায়গাটিকে বেছে নিতে, যার নামকরন করলাম –আস্থাকুড় । মানে একটি সাধারন বঙ্গবাসীর বাড়ী বোঝাতে একটি বসত বাড়ী ও একটি কচুরীপানা যুক্ত ডোবা ওরফে পুকুর মাঝে ময়লা ফেলার জায়গা,নাম–আস্থাকুড় । ক্রমশ আস্থাকুড়ের আধুনীকরনে তা উন্মুক্ত ডাষ্টবীন হয়ে রাস্তার পাশে পাশে জায়গা করে নিলো। আর সেগুলি গবাদি পশুদের ও রাস্তার সারমেয় কুলের চারণের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহারের স্বীকৃতি পেলো । এর মধ্যে রাস্তার ধারে কাঁচা ড্রেনের বর্জিত দ্রব্যগুলির অবস্থিতির জন্য সামান্য বর্ষায় এগুলির সঙ্গে ডাষ্টবীনের মিলন মশক কুলের প্রয়োজনের অনেক আঁতুড় ঘর তৈরী হলো। আমরা আগেই রক্ত মাংসের জন্তুদের উৎখাত করে ফেলেছি তাই বাঁচার তাগিদে মশক কুল আমাদের গবাদি পশুদের ও রাস্তার সারমেয় কুলের সামান্য রক্তে বাঁচার তাগিদ পুরন না করতে পেরে আমাদের গৃহে অনাহুত হয়েও মানুষের রক্তে তাদের পেট ভরাতে ও মুখ বদল করতে লাগলো । তা ছাড়া মশক কুলের কাছে মানুষের রক্ত অনেক সহজ লভ্য আর অনেকটা মুখোরচক ফাষ্ট ফুডের মতো।

আমরা নিজেদের রোগ প্রতিহারের জন্য মশাহীন দেশের সাহেবদের টীকা করনের আবিষ্কার এর উপর আস্থা রেখে অজান্তে মশাদেরও ইম্যুনিটীর ব্যবস্থা করে ফেললাম ।সাহেবদের আবিষ্কৃত যাবতীয় কেমিক্যাল ব্যবহারে অনেক মশা আমরা মেরে ফেলেছি তবে তাদের শেষ করতে পারিনি। অষুধের প্রভাবে আধমরা হয়ে কিছু মশা ডারউইন সাহেবের বক্তব্যকে মনে রেখে আনন্দে প্রতি সপ্তাহে বংশবৃদ্ধি করতে পারছে ।আমরা মশা প্রতিরোধে এর বেশী কি করতে পারি–মশাদেরতো পেটো বা রাম চাকু মারতে পারিনা । এটাও মনে রাখা দরকার যে সাহেব তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করতে আমরা অনেক রক্ত ঝরিয়েছি তাই মশাদের সামান্য কয়েক ফোঁটা রক্ত দিতে আমরা ভয় পাইনা । এক দু ফোঁটা রক্ত আমরা প্রতিদিন তাদের খাবারের জন্য দান করতে পারি –হুল ফুঁটিয়ে মশা তা টেনে নিতেই পারে।আমাদের আপত্তি শুধু একটাই আর তা হচ্ছে যদি ভাল ভাবে সাবান মেখে স্নান সেরে আর মুখটি টুথপেষ্ট দিয়ে ব্রাশ করে মশারা সেই এক ফোঁটা রক্ত নিতে থাকে তবে সান্ – না ঠিক শব্দ – ডটার অফ দি সয়েলদের আমরা তাদের এই ভুখন্ডে থাকার সুব্যবস্থা করে দিতে পারি। এরকম একটা ‘মও’ মানে মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্টান্ডিং হতে পারতো। আমাদের আপত্তি শুধু এই যে মশাদের মুখের লালাসিক্ত ভাইরাস গুলি যেন এক ফোঁটা রক্তের প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা স্বরুপ মশারা আমাদের শরীরে না দান করে।মশাদের এই রক্ত খাওয়া প্রকৃতির নিয়ম তাই তা মেনে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু যেটা একেবারেই কাম্য নয় সেটা হচ্ছে যে বেশ কিছু নামী দামী ভাইরাস যা তারা বহন করে তা কামড়ের সঙ্গে আমাদের শরীরে অযাযিত ভাবে প্রবেশ করিয়ে দেয়।।একটা মানুষের মত দেহ পেয়ে মুহুর্ত মধ্যে ঐ ভাইরাস সকল (যে কোনো একটাই যথেষ্ট) মানুষের সচল কোষগুলি সব বিকল করে নিজেদের বংশ বৃদ্ধির কাজে লাগাতে থাকে। অনেকেই এই ধাক্কা সামলাতে পারেনা তাই প্রচুর বংশবৃদ্ধি করে ভাইরাসটি মানুষটিকে শেষ ঘুম পাড়িয়ে দেয়।এর প্রতিকার হিসেবে তাই নানা রকম প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা আমরা করে থাকি। রবি ঠাকুর বেঁচে থাকলে জুতা আবিষ্কারের মত মশা নিধনে আমাদের ইনোভেটিভ প্রচেষ্টা গুলিকে নিয়ে একটা নতুন কবিতা লিখতে পারতেন আর তা পড়ে আমাদের প্রভুত আনন্দ ও জ্ঞান লাভ হতো । আই আই টী তে অষুধ মেশানো ধোঁয়া ফগ মেসিন দিয়ে রাস্তা ঘাটে ছড়িয়ে দিয়ে মশাদের বিকেল বেলায় ক্যাম্পাসের বাইরে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রন জানানো হয়। গত ৩০–৪০ বছর হাজার হাজার মশক জেনারেশন (২ সপ্তাহ জীবন কাল এক মশার) এই ফগ ধোঁয়াতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মশারা ক্যাম্পাসের বাইরে বেড়াতে যাবার সময় হিপোক্রীট মানুস বলে রসিকতা করে। ৫–৭ বছরে ঘন ঘন একই অষুধ খেলে এক মানুষের সেই অষুধ কাজ করেনা আর লক্ষ লক্ষ জন্মের মশক কুলের কেরোসিন যুকত ফগের অষুধে কাজ হবে এ ধ্রীষ্টতা শুধু আঁতেল ব্যক্তিরাই ভাবতে পারেন। আরো একটা অত্যন্ত উর্বর প্রচেষ্টার কথা বলি ।দেশকা নমকের স্থান না হলেও ভারতের প্রায় সব নোবেল প্রাইজ পাওয়া নগরের নগরপালদের অত্যন্ত ইনোভেটিভ উপায়ের কথা । জানা গেলো যে চিকেনগুনিয়ার ভাইরাস শুয়র বাহিত তখন রাস্তার শুয়র কুলকে তাদের আস্থাবলে মশারি দিয়ে ঢাকার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে নগরপালেরা শুয়রস্থিত ভাইরাসকে বহন করা মশাদের আটকে রাখার নিষ্ফল চেষ্টাও করলেন।কল্পনা করুন সেই দৃশ্য – মশারির ভিতরে শুয়ররা ঘুমোচ্ছে আর আমরা লাঠি হাতে মশারিবন্দী শুয়রদিকে কোরানটাইন করার ব্যবস্থা করছি ।

এবার নতুন ফতোয়া জারী হলো যে জল উন্মুক্ত পাত্রে রাখা যাবে না। কারন মশারা এর মধ্যে স্ট্রাটেজী পরিবর্তন করে ফেলেছে আর তারা খারাপ জলে ডিম পাড়ছে না বরং তারা পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ছে।এদিকে স্বভাব যায়না মলে তাই চা পিপাসু বঙ্গবাসী প্লাষ্টিকের ভাড়ে–অন্যথায় মাটির ২০ মিলিলিটার চা তিন চুমুকে শেষ করে খালি ভাড়টি রাস্তার ধারে ছুড়ে দিয়ে নিজের বাড়ীর জল ধরা পাত্রগুলি মশা টাইট (অনেকটা এয়ার টাইটের মত)আছে কিনা দেখতে ছোটেন।এরপর একটু বৃষ্টি নেমে ভাড়গুলি জলজমা রাস্তায় অল্প জল ভরা অবস্থায় নৌকোর মত দুলতে দুলতে সপ্তাহ খানেক স্থিতু হয়ে আধুনিক মশাদের পরিষ্কার বৃষ্টি জলের মেকসিস্ট আতুঁড়ঘরের ব্যবস্থা করে ফেলে। আমাদের নগর রক্ষক বিজ্ঞাপন দিলেন যে জল ঢেকে রাখতে আর আমরা খেলার ধারা

ভাষ্য দেখতে দেখতে বেশ কয়েক ভাড় চা খেয়ে ক্লাব ঘরের সামনের রাস্তায় স্বভাবমত ভাড় গুলি রোজ ফেলে দি । এর সঙ্গে স্বাস্থ সচেতন সবুজহৃদয় ব্যক্তিগন কচি কচি ডাবের জল পান করে জল বিহীন ডাবগুলিকে রাস্তায় ধারে ফেলে দিয়ে গেলেন।বৃষ্টির জল পেয়ে এই ডাব সকল চায়ের ভাঁড়ের সঙ্গে কম্পিটিশন করা আরম্ভ করলো। চিত্রটা অনেকটা কাশ্মীরের ডাল লেকের উপর ভাস্যমান বিভিন্ন মাপের শিকারা আর নৌকোর মত। তফাৎ শুধু এই যে এরা তাজা বৃষ্টির জল নিয়ে মশাদের ডিম পাড়ার আমন্ত্রন জানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। মশাদের ভ্রমনের কমেন্টরী গরম খবরের জন্য মিডিয়াও করে থাকে ।তাই গভর্নর সাহেব বা মন্ত্রীর বাড়ীতে একটা মশা দেখতে পেলেই একে বারে হই হই রই চই ,টীভী তে ব্রেকিং নিওজ –দমকল,পুলিস,আম্বুলেন্স সব চলে আসে । সেখানে মশাদের নয় কিন্তু আপামর জনতাকে তাঁরা মনে করিয়ে থাকেন যে মশাদের এই ভ্রমন সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, পাস নেই– আর প্রোটোকলের তোয়াক্কা না করে ভীআইপীর দিকে এগোলে দেশের শুভচিন্তকেরা তা বরদাস্ত করবে না – এবার তাঁরা সত্যই কামান দেগে দেবেন।

এ প্রসঙ্গে আপনাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন যে মশাদের জন্য কয়েকটি অভয়ারন্ন তৈরী করার ব্যবস্থা করে দিন। এল টী সীর অভয়ারন্ন ভ্রমনে বাঘ না দেখতে পেলেও মশার কামড়ের স্মৃতি নিয়ে বাড়ী ফিরবেন। ভাবুনতো যে এই সহর মশাহীন তাই পুরানো স্মৃতি হিসেবে কয়েক বছর পরে এই কামড় খাওয়ার ব্যাপারটা আপনাদের কেমন লাগবে। কেষ্ট ঠাকুরের দুরদর্শিতা আমরা বুঝতে পারিনি, পান্ডবেরা তাঁর স্নেহ ধন্য ভক্তগন তাই তাঁর নিষেধ তারা মেনে নেয়ে ছিলেন ।তিনি মশাদের থেকে অনেক দূরে থেকেছেন ও নিজের আচরনে তা বোঝাতে চেয়েছেন । যুক্তিবাদী বাঙ্গালীরা ‘বিশ্বাসে কেষ্ট মেলে...’ বাক্যটি যথেষ্ট অপছন্দ করে। তাই তাঁর কথা আমরা শুনতে বা বুঝেতে চাইনি । বাঘে বা পুলিসে ছুলে ক ঘা বঙ্গবাসী তা ভুলে গিয়ে মশার কামড়ে ঘা টা আরো বেশী কিনা গুনতে বসেছে । তবে কেষ্ঠ ঠাকুরের আদি বাড়ীর কাছে আমার অনেক দিন থাকা ও আমার গরুর মতন মুখমন্ডল দেখে তিনি আমায় কৃপা করে এক উপায় বাতলে দিয়েছেন। তাই মশা থেকে মুক্তি আপনারা যদি সত্যি চান তাহলে সেই উপায়টা আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করতে পারি। এটা প্রয়োগ করতে পারলে দেখবেন যে সব মশারা হয় সুন্দরবন বা করবেট পার্কে মাইগ্রেট করে গেছে। বাঘের রক্ত বাঙ্গালীর রক্তের থেকেও বেশী উপকারী বক্তব্যটা কয়েকটা সেমিনার করিয়ে মশাদের বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব নিতে আমার আপত্তি নেই।এর জন্য নয়ছয় করার টাকা হু,বিশ্বব্যাঙ্ক বা আমাদের স্বাস্থ বিভাগ দেবার জন্য ব্ল্যাঙ্ক চেক নিয়ে বসে আছেন।তাঁরা সবাই আমার মশাদের না মেরে পুনর্বাসনের প্রচেষ্টাতে আর্থিক সাহায্য করতে রাজী আছেন ।মনে রখবেন যে আমিও জীম করবেটের মত বাঘেদের ভালবাসি তাই জানি যে মশার কামড়ে তাদের ডেঙ্গু , ম্যালেরিয়া বা মশা বাহিত কোনো রোগ হবে না। রাস্তার গরু বা কুকুর দেরই এসব রোগ হয়না কাজেই মানুষ ছাড়া অন্য কেষ্টর জীবেদের মশা কিছু করতে পারবে না । তাই বলি যে আপনারা শুধু ইচ্ছে প্রকাশ করুন।আমি একা পারবো না ডেমোক্রেসীতে জনতার ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা।